সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৪

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৪

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৯—১৯১১

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩—৮।১১।১৯৪৩

১৩১১ সালের আশ্বিন মাসে 'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' পুস্তকে ইন্দ্রনাথ আত্ম-কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। এই আত্মকাহিনী সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

জন্ম ; ছাত্র ও কর্ম্মজীবন

শকাব্দাঃ ১৭৭১।২ জ্যৈষ্ঠ সোমবার কৃষ্ণা-সপ্তমী শ্রবণা নক্ষত্রে মাতুলালয় পাণ্ডুগ্রামে বেলা অনুমান দেড় প্রহরের সময়ে আমার জন্ম। পাণ্ডুগ্রাম আমার বর্ত্তমান বাসস্থান গঙ্গাটিকুরী হইতে ঈষৎ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রায় ৪ ক্রোশ। গঙ্গাটিকুরী,—বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী।

পিতাঠাকুর [বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়] পূর্ণিয়ার উকীল ছিলেন। আমার যখন সাত মাস বয়ঃক্রম, তখন পিতামাতার সঙ্গে প্রথম পূর্ণিয়া যাই। নবম বর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ণিয়াতেই থাকিতাম ; কেবল বৎসর বৎসর ৺শারদীয় পূজার সময়ে গঙ্গাটিকুরীর বাটীতে আসিয়া মাসেক-দেড় মাস থাকিতাম। পূর্ণিয়ায় প্রচলিত ভাষা হিন্দী বা উর্দ্দু।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে আমার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। গুরু মহাশয় বলাই সরকার আমাদের সঙ্গে বিদেশে থাকিতেন, তাঁহারই কাছে বিদ্যারম্ভ বলিতে হইবে।

বাঙ্গলা লেখা-পড়া কিছু ভাল করিয়া শেখা হইল না ; বোধ করি, ষষ্ঠ বর্ষেই পূর্ণিয়ার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে আমি ভর্ত্তি হইয়াছিলাম।

ঐ স্কুলে তখনকার থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। ইংরেজী পড়িতাম, উর্দ্দু অতি অল্প, বাঙ্গলা মোটেই পড়িতাম না।…

আট বৎসর বয়সের সময়ে আমার উপনয়ন,—গঙ্গাটিকুরীতে হইয়াছিল। নবম বর্ষে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহাও টিকুরীতে।

পিতৃবিয়োগে আমরা আর পূর্ণিয়া গেলাম না। কৃষ্ণনগর কালেজে পড়িতে গেলাম। যখন ভর্ত্তি হই, তখন সেসনের অন্তিম কাল, সেই কারণে আমাকে সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্ত্তি হইতে হইয়াছিল।…অধিক দিন কৃষ্ণনগরে পড়া হইল না। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরও কৃষ্ণনগরে পড়িতেন, তিনি পীড়িত হইলেন। কঠিন জ্বর প্লীহাদি। কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিলাম। কিছু কাল পরে আমার জ্যেষ্ঠের সহিত বীরভূমে পড়িতে গেলাম। ইহা বোধ হয়, ১২৬৪ কি ১২৬৫ সালে।

বীরভূম গবর্ণমেণ্ট স্কুলে। তৃতীয় শ্রেণীতে প্রথমতঃ ভর্ত্তি হই। তাহার পর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াও কিছু কাল সেখানে পড়িয়াছিলাম। দেড়ের উপর দুই বৎসর কি কিছু কম বীরভূমে পড়িয়াছিলাম। এত কাল পর্য্যন্ত আমার জ্যেষ্ঠ অল্পাধিক পীড়াই ভোগ করিতেছিলেন। মনে হইতেছে, ১২৬৭ সালের কার্ত্তিক মাসে জ্যেষ্ঠের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ইতিমধ্যে ১২৬৬ সালের ১৩ ফাল্গুন গঙ্গাটিকুরীর পার্শ্ববর্ত্তী বান্দুটিয়া গ্রামে ৺বনমালিচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে আমি বিবাহ করি।

জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হওয়াতে আর বীরভূমে থাকা হইল না।… ভাগলপুরে পড়িতে গেলাম। সেখানে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সেকেণ্ড

ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া, ক্রমে ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বরে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া ভাগলপুর ত্যাগ করি।

বীরভূমেই বাঙ্গলা শিখিতে আরম্ভ করি। ভাগলপুরে বাঙ্গলা শিখিবার সুযোগ ছিল না, উর্দ্দু পড়িতাম। কিন্তু এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা বাঙ্গলাতেই দিয়াছিলাম। সে কেবল বাহুবলে বলিতে হইবে। কেন না তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা কিছু শেখা হয় নাই।

এনট্রান্স্ পাস্ করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়িতে গেলাম। আগে কখনও কলিকাতা দেখি নাই। কলিকাতা গিয়া আমার শরীর ভাল ছিল না, মনও ভাল ছিল না। ৩।৪ মাস পরেই স্কলারসিপ ট্রান্সফর করাইয়া হুগলী কালেজে আসিলাম।

আমি আজন্মই অলস। পড়া-শুনায় আমার আটা হয় না। ১৮৬৫ সালের ৺শারদীয় পূজার সময়ে বাটী আসিয়া আমার প্রবল জ্বর হয়। অগ্রহায়ণ মাসে পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত আমার জ্বর, কাজেই পড়া হইল না। তথাপি পরীক্ষা দিলাম, যথাবিধি ফেল হইলাম।…

ফেল হইয়া দুঃখ হইয়াছিল, লজ্জাও হইয়াছিল। হুগলী কালেজে আর ফিরিয়া গেলাম না। কলিকাতায় গিয়া ফ্রী-চর্চ্চে ভর্ত্তি হইলাম। ফ্রী ছাত্র হইয়া ভর্ত্তি হইবার প্রার্থনা করাতে কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন যে, 'এক মাস তোমাকে ফ্রী রাখিব, যদি মাসিক পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিতে পার, উত্তম ; নচেৎ ইহার পর বেতন দিতে হইবে।'…মাসিক পরীক্ষায় উচ্চ স্থানই অধিকার

করিলাম। বৃত্তিও পাইলাম। মাসে মাসে এইরূপ বৃত্তি পাইতে থাকিলাম। ক্রমে ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষা...দিই।

হুগলী কালেজের প্রিন্সিপাল Thwaytes (থোয়েটস) সাহেব আমাকে—আমাকে কেন প্রায় সকল ছাত্রকেই—খুব ভাল বাসিতেন। ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি, দেখিয়া, তিনি আমাকে জোর করিয়া হুগলী কালেজে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। থার্ড ইয়ার্ এবং ফোর্থ ইয়ারের অর্দ্ধেক হুগলী কালেজে পড়িলাম। তখন শতকরা পঁচাত্তর দিন কালেজে উপস্থিত হইবার নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে দেখিলাম যে, আমি হুগলী হইতে বি, এ, পরীক্ষা দিতে পাইব না। অগত্যা একটু নীতি খাটাইয়া কলিকাতার কেথিড্রাল মিশন কালেজে ট্রান্সফার হইয়া গেলাম। সেইখান হইতে বি, এ, পরীক্ষা দিলাম। ১৮৬৯ জানুয়ারিতে আমি গ্রাজুয়েট হইলাম।

পরীক্ষার পর ছয় সাত মাস গঙ্গাটিকুরীতে বসিয়া কাটাইলাম। তাহার পর...আমি মাষ্টারি স্বীকার করিয়া বীরভূম জেলার হেতমপুর স্কুলে মাস দুই হেড মাষ্টার হইয়াছিলাম। এমন সময়ে বর্দ্ধমান জেলার ওকড়সা গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টারি পাওয়াতে আমি হেতমপুর ত্যাগ করিলাম। ওকড়সায় বৎসরের শেষ কয় মাস কাটাইয়া ১৮৭০ সালের প্রারম্ভে আবার কলিকাতায় গিয়া (B. L.) বি, এল পরীক্ষার লেক্‌চর সারা করিলাম এবং ১৮৭১ সালের জানুয়ারিতে পরীক্ষা দিয়া নিতান্ত ঠেলাঠেলি করিয়া বি-এল হইলাম। ১৮৭১ সালের মার্চ্চ মাসে হাইকোর্টে নাম লেখাইলাম; এবং সেই হইতে হাইকোর্টের জয়পত্র মাথায় বান্ধিয়া ভবের ঘানিতে যোড়া রহিয়াছি।

আমার বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে স্থূলকথা এই যে, আমি অল্পই পড়িয়াছি ; তবে, অল্প যাহা পড়ি, তাহা সুজীর্ণ করি, তাহাতে অম্লোদ্গারাদি হয় না, বলাধানই হয়। আর এক কথা এই যে, আমার পড়া-বিদ্যা অপেক্ষা কুড়ান বিদ্যা বেশী। আমি কুড়াইয়া বহু বিদ্যা লাভ করিয়াছি।

আমার পিতাঠাকুরের কর্ম্মস্থান পূর্ণিয়াতেই আমি প্রথম ওকালতী করিতে গিয়াছিলাম।...পূর্ণিয়াতে দীর্ঘকাল থাকা হইল না। মাস দুই মধ্যেই আমি মুনসেফি পাইয়া ঐ জেলায় ডণ্ডখোবা চৌকীতে গেলাম। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত মুন্সেফ ছিলাম, কিন্তু জ্বরে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলাম। ৺পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া আর সেখানে ফিরিয়া গেলাম না। আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে দিনাজপুরে ওকালতী করিতে গেলাম। ১৮৭১ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৮৭৬ সালের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর পর্য্যন্ত দিনাজপুরে কাজ করিয়া, হাইকোর্টে ওকালতী করিতে ইচ্ছা হইল।

কলিকাতা হাইকোর্টে ১৮৮১ সালের জুলাই কি আগষ্ট পর্য্যন্ত ছিলাম। তাহার পর হইতে বৰ্দ্ধমানে আছি।

সাহিত্য-সেবা

ই° ১৮৭০ সালে ইংরেজী এনট্রান্স কোর্সের নোটস্ লিখিয়া গুপ্তপ্রেসে ছাবাইতেছিলাম, সেই সময়ে সেই প্রেসে একখানি বাঙ্গলা নাটকও ছাবা হইতেছিল। মনে হইতেছে, সেই নাটক দেখিয়াই একটুকু ব্যঙ্গ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল ; ইচ্ছা

হইল; অতি ক্ষুদ্রকায় এক কবিতা পুস্তক লিখিয়া ফেলিলাম, নাম দিলাম—"উৎকৃষ্ট কাব্যং।" গুপ্তপ্রেসেই তাহা ছাবান হইল।...পুস্তকের মূল্য করিয়াছিলাম ৵১২॥৹ সাড়ে বারো গণ্ডা, অর্থাৎ আড়াই পয়সা, তাহাতে ভারি রঙ্গ হইল, প্রত্যেক ক্রেতাকেই অন্য স্থান হইতে আধলা ভাঙ্গাইয়া আনিতে হইয়াছিল; কেন না, কেহ তিন পয়সা দিতে আসিলে তাহা লওয়া হইত না।...তাহার পর ১২৭৯ কি ১২৮০ সালে তৎকালীন দার্জ্জিলিঙ বিভাগের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব বাক্সিনেশন্ আমার প্রিয় সুহৃদ "স্বর্ণলতা" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা যশস্বী ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্য উপলক্ষে যখন দিনাজপুরে আইসেন, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে বহু আলাপ তাঁহার সঙ্গে হইত। "স্বর্ণলতা"র এক কি দুই অধ্যায় মাত্র তখন লেখা হইয়াছে এবং রাজসাহীর বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসের "জ্ঞানাঙ্কুর" পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তারকনাথ আমাকে আপন রচনা দেখাইলেন, এবং "জ্ঞানাঙ্কুরে" লিখিতে অনুরোধ করিলেন। সেই অনুরোধের ফলে ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে কি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে আমি "কল্পতরু" লিখি। আমার বাসার উঠানে গুটিকতক ফলগাছের সম্মুখে দূর্ব্বাঘাস লাগাইয়াছিলাম। অতি সুন্দর দূর্ব্বাবন উৎপন্ন হইয়াছিল, সুশ্যামল, সুদীর্ঘ—বায়ুভরে দোলায়মান তেমন দূর্ব্বাবন আর বুঝি দেখি নাই। প্রত্যহ কাছারী হইতে আসিয়া সেই দূর্ব্বাবনের উপর মাদুর পাতিয়া,—কবিহৃদয়হারী সুকোমল সান্দ্র-সুশীতল সেই সুখাসনে বসিয়া, একটী টীনের বাক্সের উপর কাগজ রাখিয়া "কল্পতরু" লিখিয়াছিলাম। "কল্পতরু" লিখিতে ১৮।১৯ দিন লাগিয়াছিল। "কল্পতরু" রাজসাহী

গেল, শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাশয় পুস্তক পাওয়া সংবাদ দিলেন ;···প্রায় ৫।৬ মাস কি তদধিক কাল পরে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু বিনয়পূর্ণ এক পত্রে আমাকে জানাইলেন যে, "কল্পতরু" উপাদেয় গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহা "ব্রহ্মের" নিন্দাসূচক, কেমন করিয়া তাহা "জ্ঞানাঙ্কুরে" প্রকাশিত হইতে পারে।···"কল্পতরু" ফিরিয়া পাইলাম। তাহার পরে আপন ব্যয়ে কলিকাতায় ছাবাইয়া গ্রন্থকার হইলাম।

গ্রন্থ রচনার ঝোঁক থামিয়া গেল। তবে মধ্যে মধ্যে অক্ষয় দাদার (শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার) "সাধারণী"তে পত্রে-প্রবন্ধ লিখিয়া সময়ে সময়ে সাহিত্যিক কণ্ডুয়নের নিবৃত্তি করিতাম।

কলিকাতা হাইকোর্টে যখন ওকালতী করি, তখন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে কিছু কাল আমার বাসা ছিল। এই বাসায় প্রায়ই সাহিত্যিক-সংঘ হইত। এই সংঘে ৺অঘোরনাথ কুমার একজন নিত্যসেবক ছিলেন। সাহিত্য-ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় সমাচার, এবং তদতিরিক্ত রাজনৈতিক গগনের জ্যোতিষ্কগণের গতাগতির স্থূল সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল অঘোরনাথ নিত্য নিত্য সংগ্রহ করিয়া আমাকে উপঢৌকন দিতেন। তাহাতেই কি জানি কেমন করিয়া, আমার কবি-কণ্ডূতির উদ্রেক হইল। ইং ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে "ভারত উদ্ধার" লিখিয়া ফেলিলাম।··"ভারত উদ্ধার" বাজারে বাহির হইল; অমনি দেবগণ মুষলধারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মলয়জ গন্ধে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, পক্ষাপক্ষ নিবৃত্ত হইয়া, দিবারাত্র কেবল কৌমুদী কেলি হইতে লাগিল ;—আমার শুভ্র যশোরাশির ভয়ে ধরণী ভারাক্রান্তা হইয়া যেন ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিলেন।

ধরিত্রীকে আমি অভয় দিলাম,—ভয় নাই,—আর বোধ হয়, আমি লেখনী চালাইব না।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসাতেই অক্ষয় দাদা আর আমি দুই জনে "হাতে হাতে ফল" নাম দিয়া এক প্রহসন লিখিয়াছিলাম। চুঁচুড়াতে তাহা ছাপাও হইয়াছিল, কিন্তু সাহিত্যের বাজারে তাহাকে ছাড়া হয় নাই। অক্ষয় দাদার বাড়ীতে সে পুস্তক থাকিতেও পারে।

তাহার পর ঐ বাসাতেই "পঞ্চানন্দের" সূত্রপাত হয়। অক্ষয় দাদার সঙ্গে একপরামর্শী হইয়া পঞ্চানন্দ লিখিতে আরম্ভ করি, কিন্তু কতক কতক লিখিয়া, যাই চুঁচুড়ায় পাঠাইয়া দিলাম, অমনই দাদা তাহা 'সাধারণী'র উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। দুই একবার এইরূপ হইবার পর, একবার চুঁচুড়ায় গিয়া দুই জনে এক খণ্ড পঞ্চানন্দ লিখিলাম, তাহা ছাপানও হইল। কিন্তু আমাদের উভয়েরই আলস্য, এবং ঔদাসীন্য রীতিমত পঞ্চানন্দ চালাইবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। বোধ হয়, একখানি ছাপা [illegible] পঞ্চানন্দ কাহারও নাই।*

কলিকাতা সহরে ভবানীপুরে আমার বাসা উঠিয়া গেলে পর, ভূধর গঙ্গোপাধ্যায়—[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]হেন—প্রভৃতি কতকগুলি যুবক পঞ্চানন্দ বাহির করিবার প্রস্তাব করিয়া আমাকে [illegible] বসিলেন। বোধ হয়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। যাহা হউক,

* বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'পঞ্চানন্দ', ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (পৃ. ২৬) সাধারণী যন্ত্র হইতে ২৬ অক্টোবর ১৮৭৮ তারিখে প্রকাশিত হয়।—ব্র. না. ব.

তাঁহারা কাগজ চালাইবেন, ছাবাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দেওয়াতে আমি লিখিতে সম্মত হইলাম। 'পঞ্চানন্দ' রীতিমত বাহির হইতে লাগিল।*

তাহার পর আমি হাইকোর্ট ছাড়িয়া বর্দ্ধমানে আসিলাম। বর্দ্ধমান হইতে কয়েক খণ্ড পঞ্চানন্দ বাহির করিলাম। কিন্তু রীতিমত কাগজ চালান আমার কাজ নহে, ধারা রাখিতে পারিলাম না।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু পঞ্চানন্দের লাগিয়া আমাকে আক্রমণ করিলেন। শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়াও এ আক্রমণে বসুজের প্রবল সহায় ছিলেন। আমি পরাভব স্বীকার করিয়া বঙ্গবাসীতে "পঞ্চানন্দ" দিতে লাগিলাম।

'বঙ্গবাসী'র উপহার দিতে হইবে বলিয়া, আমি 'ক্ষুদিরাম' লিখিতে সম্মত হই।...

এই ত আমার মাতৃভাষার চর্চ্চা। দুই চারিটা প্রবন্ধ রচনাও করিয়াছি, কিন্তু ধারা ধরিয়া আর কোনও গ্রন্থ লেখা হয় নাই। তবে দিনাজপুরে থাকিতে 'সিরাজউদ্দৌলা' নামে এক নাটক লিখিয়াছিলাম, তাহা ছাবান হয় নাই। কলিকাতায় কে

---

* ইহা ১২৮৭ সাল হইতে প্রকাশিত হয়। ১২৮৭ সালের ৩য় সংখ্যা 'বান্ধবে' দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা 'পঞ্চানন্দে'র যে-সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"১। 'পঞ্চানন্দ। রস-প্রধান পত্র ও সমালোচন। ভবানীপুর সুধাকর-যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।'—...দুই তিন বৎসর হইল পঞ্চানন্দ বাঙ্গালা-সাহিত্য-গগনে প্রথম উদিত হইয়া, দেখা দিতে না দিতেই, ধূমকেতুর মত দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যান। এইবার তাঁহার দ্বিতীয় প্রকাশ।..." ব্র. না, ব.

তাহা আমার নিকট চাহিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কে, তাহা আমার মনে নাই। 'সিরাজউদ্দৌলা'ও আর আমাকে জ্বালাতন করেন নাই।

গ্রন্থাবলী

ইন্দ্রনাথ যে কয়খানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল :—

১। **উৎকৃষ্ট-কাব্যম্।** ১১ শ্রাবণ ১২৭৭ (ইং ১৮৭০)।

উৎকৃষ্ট-কাব্যম্। শ্রীমতা গুহকর্ণা এগু কোম্ভা বিরচিতং। ভিন্নরুচিহি লোকঃ।

"শিশিরে কি ফলে ধান্য বিনা বরিষণে ?
কত লোকে কত বলে সকলে কি শুনে ॥
"যস্মিন্ দেশে যদাচার—
... ...

১২৭৭—মূল্য (সাড়ে বার গণ্ডা পঞ্চাশ কড়া মাত্র।)

২। **কল্পতরু।** (উপন্যাস) জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)।

কল্পতরু। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

——Et me fecere poetam
Pierides . * * * * : me quoque dicunt
Vatem pastores ; sed non ego credulus illis ;
Nam neque adhuc Varo videor, nec dicere Cinna
Digna, sed argutos inter strepre anser olores."
—Virgil.

ক্যানিং লাইব্রেরী ; কলিকাতা। সন ১২৮১ সাল।

বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী'তে উৎসর্গ-পত্রটি মুদ্রিত হয় নাই। উহা এইরূপ :—

প্রণয়াধার শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয়কে এই গ্রন্থ প্রেমোপঢৌকন দিলাম।

"শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা ?"

দিনাজপুর
জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ গ্রন্থকারস্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮১ সালের পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'কল্পতরু'র এক সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া, বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্য পটুতায়,—মনুষ্য চরিত্রের বহুদর্শিতায় লিপি-চাতুর্য্যে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং তাঁহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে। তাঁহার যে লিপিকৌশল, যে রচনাচাতুর্য্য, তাহা আলালের ঘরের দুলালে নাই—সে বাক্‌শক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে বঙ্গদর্শনপ্রিয়তার ঈষৎ, মধুর হাসি ছত্রে২ প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুইয়ের একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্ব্বস্থানেই মুক্তা প্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধু বাবুর মত, তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, হুতোমের মত

"বেলেল্লাগিরি"তে প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা সহনীয়। 'কল্পতরু' বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

৩। **ভারত-উদ্ধার।** (খণ্ড-কাব্য) ডিসেম্বর ১৮৭৭। পৃ. ৪৩।

পর্ব্বোপলক্ষে উপহার। ভারত-উদ্ধার। অথবা চারি আনা মাত্র। (ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা) শ্রীরামদাস শর্ম্ম-বিরচিত। "One must understand a thing to be able to enjoy it." "Every man is a caricature of himself when you strip him." কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরী শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১২৮৪।

৪। **পাঁচুঠাকুর,** ১ম খণ্ড। ১২৯১ সাল। পৃ. ৩৬২।
২য় খণ্ড। ১২৯১ সাল। পৃ. ১৬৬।
৩য় ভাগ। ১২৯২ সাল(?)। পৃ. ১৫৬।

'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ইচ্ছায় ইন্দ্রনাথ 'পঞ্চানন্দ' মাসিকপত্র হইতে প্রবন্ধাদি সঙ্কলন করিয়া দুই খণ্ড 'পাঁচুঠাকুর' প্রকাশ করেন। ইহার ৩য় ভাগটি 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত কিছু কালের "পঞ্চানন্দ" হইতে সঙ্কলিত।

গ্রন্থকার "মুখপাতে" লিখিয়াছেন :—

রহস্য এবং রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই,... বাঙ্গালায় এখন হাসিবার কিম্বা হাসাইবার দিন আইসে নাই। তবুও যে লোকে হাসে, সে আমার কপালগুণে এবং

শাসকদের বুদ্ধির অনুগত, সে পক্ষে ক্ষমতার দাবী দাওয়া কিছু রাখে না।

একটা সুসংবাদ দিয়া মুখপাতের চূড়ান্ত করিব। শাস্ত্রে আছে, কার্য্যভেদে অবতার ভেদ, পঞ্চানন্দ যে পাঁচুঠাকুর রূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার এক এবং অদ্বিতীয় কারণ—অর্থলোভ, অথবা, বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে হইলে,—লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য প্রমাণ।

৫। **ক্ষুদিরাম।** (গাল-গল্প) ইং ১৮৮৮। পৃ. ১৪২।

ক্ষুদিরাম। গাল-গল্প। (ভগ্নাংশ) শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

"ইতর তাপ শতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।"

কলিকাতা শ্রী বিহারীলাল সরকার দ্বারা ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেশিন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৯৪ সাল—চৈত্র।

৬। **ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী।** ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল। পৃ. ৯৩৩।

সূচী :—উৎকৃষ্ট-কাব্যম্। কল্পতরু। ভারত-উদ্ধার। ক্ষুদিরাম। পাঁচুঠাকুর। অন্যান্য রচনা।

প্রথম তিন খণ্ড 'পাঁচুঠাকুর' ছাড়া, "আর যত পঞ্চানন্দ-রচনা 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলি সঙ্কলিত হইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম—এই পাঁচ কাণ্ডে পাঁচুঠাকুর—এই গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত হইল।"

"অন্যান্য রচনা—'বঙ্গবাসী' ও 'নবজীবন' প্রভৃতি মাসিক-পত্রিকা হইতে ইন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত প্রবন্ধাদি সঙ্কলিত হইয়া এই গ্রন্থাবলীর শেষ ভাগে সন্নিবেশিত হইল।"

মৃত্যু

২৩ মার্চ ১৯১১ (৯ চৈত্র ১৩১৭) তারিখে ইন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল।

ইন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

ইন্দ্রনাথের তিরোধানের অব্যবহিত পরে তাঁহার সাহিত্য-সেবা সম্পর্কে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্যে' (বৈশাখ ১৩১৮) প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহধাম ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন।...

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক ইংরাজি হিসাবে সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি ব্যবহারাজীবের উপাধিধারী ছিলেন, এবং ইংরাজি সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইংরাজিতে লিখিতে ও বলিতে তিনি খুব ভালই পারিতেন। এক কথায় বলিতে হইলে, বলা চলে যে, তিনি ইংরাজি ভাষায় একজন পাকা মুন্সী ছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরাজ সাজেন নাই, ইংরাজি ভাষার ও সভ্যতার প্রবাহতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে

আত্মহারা হন নাই। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী হইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন; খাঁটী বাঙ্গালীর গৌড়ীয় ভাষায় তিনি মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার ভাষায় ইংরাজি শব্দের বা স্ফুটোক্তির অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায় নাই; তিনি ইংরাজি ভাবকে খাঁটী বাঙ্গালীর বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার লিখিত 'কল্পতরু', 'ক্ষুদিরাম' ও 'ভারত-উদ্ধার' ব্যঙ্গ কাব্যে ঝরঝরে বাঙ্গালা কথারই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সম্পাদিত 'পঞ্চানন্দ' নির্ভাজ গৌড়ীয় গদ্যে পদ্যে লিখিত হইত। 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে তিনি যে সকল রাজনীতিক বা সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়া দিতেন, সে সকলের ভাষা খাঁটী বাঙ্গালা করিবার জন্য তিনি অশেষ প্রয়াস পাইতেন। এই হেতু প্রথমেই বলিয়াছি যে, তিনি আমাদের বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ ছিলেন।

খাঁটী বাঙ্গালী থাকিবার পক্ষে তাঁহার চেষ্টাও অসাধারণ ছিল। তিনি প্রথম জীবনে ইংরাজীয়ানায় পরিবৃত থাকিলেও, শেষ জীবনে, আকারে-প্রকারে, আহারে-ব্যবহারে, সাজ পরিচ্ছদে প্রায় ষোল আনা বাঙ্গালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশ ও কালের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া, অতীতের ভঙ্গীকে এমন সাগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে তাঁহার ন্যায় ইংরাজিনবীশ কোনও বাঙ্গালীকেই আমরা দেখি নাই। গোটা ভারত জোড়া দেশহিতৈষণা এবং বাঙ্গালায় নিবদ্ধ দেশপ্রীতির কথা লইয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখককে তিনি একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহারই কতক অংশ এইখানেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"তুমি আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র একটু জান; সৌরমণ্ডলের অনুমান তুমি করিতে পারিবে। জান ত, সূর্য্যকে মধ্যে রাখিয়া নানা গ্রহ, উপগ্রহ সকল চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের ভারতের হিন্দুত্ব এই সূর্য্য সদৃশ। উহারই আকর্ষণে প্রত্যেক প্রদেশ আকৃষ্ট এবং কেন্দ্র-সংবদ্ধ। পরন্তু প্রত্যেক

প্রদেশই স্বতন্ত্র ভাবে সংস্থিত। হিন্দুত্ব এক, কিন্তু দেশভেদে হিন্দুর আচার ধর্ম্ম স্বতন্ত্র রকমের। এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিলে ভারতীয় হিন্দুত্বের পুষ্টি হইবেই। তোমার ইংরাজ বা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, undefined and indefinite units অর্থাৎ নির্দ্দেশশূন্য ও সংজ্ঞাবিহীন ব্যষ্টি লইয়া কখনও কোনও সমষ্টির সৃষ্টি হয় না—একতা সম্ভবপর নহে। আমাদের স্মার্ত্তগণও তাহাই বলেন। তাহারা বলেন যে, বঙ্গদেশ পঞ্জাবে বা মহারাষ্ট্রে পরিণত হইবে না, গৌড়জন দ্রাবিড় বা দ্রাবিড়ের আচারপদ্ধতি গ্রহণ করিবে না। অতএব বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালার অতীত যুগের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সজীব করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই বাঙ্গালা ভারতব্যাপী হিন্দুত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে। কাজেই বলিতে হয়, তোমার বাঙ্গালা দেশকে আগে সামলাও, পরে গোটা ভারতের ভাবনা ভাবিও। মনে নাই কি,—সন্ন্যাসীর সেই কথাটা। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতের ভাবনা সন্ন্যাসী, যোগী সজ্জনে ভাবিবে, প্রদেশের ভাবনা গৃহস্থে ও সামাজিকগণেই ভাবিবেন। আমি সন্ন্যাসীর এই কথাটা বেদবাক্যের মত মান্য করি।"

ইন্দ্রনাথ এই হেতু তাঁহার শেষ জীবনে বাঙ্গালার কথা, বাঙ্গালার সমাজের কথা, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের কথাই অনবরত ভাবিতেন। বাঙ্গালার দুঃখে, বাঙ্গালার অধঃপতনে, তিনি অহরহঃ কাতরতা প্রকাশ করিতেন। তাই আমি তাঁহাকে "বাঙ্গালার ইন্দ্রনাথ" এই আখ্যা দিয়াছি।

এই বাঙ্গালার ও বাঙ্গালার ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন, কতটুকু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই পরিচয়

দিব। ইংরাজিতে যাহাকে Satire বলে, যাহা বিদ্রূপ ও শ্লেষের সমবায়ে অভিব্যক্ত, ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় তাহারই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার 'ভারত-উদ্ধার' ব্যঙ্গকাব্য বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় Satire। আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, পরিহাস, উপহাস, কৌতুক প্রভৃতির বিশ্লেষণ অনুসারে ব্যবহার করেন না। ইন্দ্রনাথের লেখায় এক দিকে যেমন ইংরাজি Wit ও Humour দেখান আছে, অন্য দিকে তেমনি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, রঙ্গ, কৌতুক, উপহাসাদি যেন ছড়ান—বিছান আছে। মনে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে থাকিলে ইন্দ্রনাথের আসন বাঙ্গালার সাহিত্যসমাজে অতি উচ্চ হইত। ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে কৌতুক উপভোগ করিবার সামর্থ্য যে আমাদের অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবুও ইন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার বলে শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রই তাঁহার সরস ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অনুরাগী হইয়াছিলেন। একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আমি Satireটাকে বাঙ্গালার উপভোগ্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। ফরাসী satiristদিগের বহি পড়িয়া আমার এই সাধটা হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু De-Quinceyর মোলায়েম রসিকতা, বাঙ্গালার গাছমরীচ মিলাইয়া কমলাকান্তের আকারে বাঙ্গালীর হাটে চালাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্ত বঙ্কিম বাবুর জীবনের সরসতা শুকাইতে না শুকাইতে যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। আমার বিদেশী আমদানী Satire আমার জীবনের মাধুরীর সঙ্গে শুকাইয়া গিয়াছে। কোনটাই বাঙ্গালায় টিকিল না। তোমার দ্বিজেন্দ্রলাল Humourist বটে ; পরন্তু বেজায় emotional ; নির্ব্বেদ হইয়া সংসারের উদ্ভটতা ও উৎকটতাকে দেখাইতে পারে না ; একটু

যেন নিজে মাতিয়া উঠে। বিধাতার কষাঘাত যখন উহার পিঠে পড়িবে, তখন তাহার এই অপূর্ব্ব Humour এবং নির্ম্মল তটিনীকল্লোল একেবারেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই বলিতে হয়, আমাদের এই নূতন আমদানীর মাল বর্ত্তমান বাঙ্গালার হাটে বিকাইল না।”

ইন্দ্রনাথ যে সাহিত্য-সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন, তেমন সঙ্ঘ বাঙ্গালায় কদাচিৎ ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্ঘের কেন্দ্র-মূর্ত্তি ছিলেন; হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, রামদাস, রাজকৃষ্ণ, জগদীশ প্রভৃতি মনীষী মনস্বী সকল উহার সদস্যরূপে বিরাজ করিতেন। ইন্দ্রনাথ এই দলের রসিক ছিলেন। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন যে, “ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য-আকাশের Halley's comet, যখন ফুটিয়া উঠে, তখন উহার প্রভায় দশ দিক্ আলোকিত হইয়া উঠে। পরন্তু সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পায়। কে জানে, কাহার কোন অন্ধকার কোণটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর দেশশুদ্ধ লোকে তাহা দেখিয়া হাসিবে ও হাত-তালি দিবে।” ইন্দ্রনাথের সাহিত্য-সামর্থ্যের এমন পরিচয়পত্র আমি আর দেখি নাই। ইন্দ্রনাথের মনীষার পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র চারিটি কথায় যেরূপ ফুটাইয়াছিলেন, তেমন ভাবে ফুটাইতে আর কেহ পারিবে না।

Satirist-এর অবলম্বন *bonhomie* ইন্দ্রনাথের খুবই ছিল। একটা গল্প বলিব। গত ১৮৮৭ কি ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের শীতকালে ইন্দ্রনাথের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাৎকারের সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিয়াছিলেন, ”ইন্দির, তুই ত আমাকে নিয়ে কোনও রকম পরিহাস করিস্ নি। আমি কারণ ঠাওরে উঠ্‌তে পারিনে।” উত্তরে ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন,—“যখন অনুমতি পাইলাম,

তখন করিব।" কিছু দিন পরেই বঙ্গবাসীতে "নষ্টে মৃতে"র ব্যাখ্যা বাহির হইল, বোধোদয়ের ব্যঙ্গ বাহির হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের মারফতে ইন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, এত দিন পরে আমার একটা ব্যঙ্গ করা সার্থক হইল।

ইন্দ্রনাথের শ্লেষ ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যশূন্য ছিল না। কেবল হাসাইবার জন্য তিনি হাসাইতেন না। তাঁহার হাসির নিম্নস্তরে হতাশার দীর্ঘশ্বাস যেন ফুটিয়া উঠিত। তাহার হাসির হলহলার মধ্যে শোকের সকরুণ রোদনধ্বনি শুনা যাইত। দেশের দুঃখ ও সমাজের অধোগতি দেখিয়া রোদনে কুলাইত না বলিয়াই তিনি হাসিতেন। তাঁহার 'ক্ষুদিরাম' পুস্তকায় এই শ্মশানের বিকট হাস্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ক্ষুদিরাম যে পড়িতে জানে, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবে; অথচ উহার শব্দচাতুরী এমনই অপূর্ব্ব, উহার ভাব ও ঘটনাবিন্যাসকৌশল এমনই অসামান্য যে, এক এক স্থানে পড়িতে পড়িতে হাস্য সংবরণ করা যায় না। এবংবিধ হাস্যের কার্পাস আবরণে শোকের অশ্রুধারা তাঁহার 'ভারত-উদ্ধারে' ও 'কল্পতরু'তে আছে; পঞ্চানন্দের বহু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষে পাওয়া যায়। লেখকের আরাধ্য আদর্শের পরিচয় পাইলে হাসির মধ্যে কান্নার অংশটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইন্দ্রনাথ পুরাতন হিন্দুর আদর্শে মুগ্ধ ছিলেন। অপূর্ব্ব ভাষায় তিনি সেই আদর্শ হইতে চ্যুতিজন্য সামাজিক উদ্ভটতা সকলের বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক এক স্থানে তিনি নিজেই সামলাইতে পারেন নাই, তাই পর্ব্বতপঞ্জর ভেদ করিয়া গিরিতটিনী যেমন বিমল অশ্রুকণার ন্যায় বিন্দু বিন্দু বারিপাত করে, তিনিও তেমনই হাসিতে হাসিতে হৃদ্গত শোকাশ্রুর দুই এক বিন্দু বাহির করিয়া ফেলিতেন। এই হিসাবে তাঁহাকে হেল্‌ভেশিয়সের (Helvetius) ভাষায় Patriot satirist বলা চলে। কর্ণেল চেস্‌নীর Indian Polity নামক গ্রন্থ

যখন প্রথমে প্রচারিত হয়, তখন "পঞ্চানন্দ" পত্রে উহার নকলে ভারতশাসনপদ্ধতির এক উদ্ভট পরিচয় দেওয়া হয়। তাহাতে লেখা হয়, বড়লাট, ছোটলাট প্রভৃতি সকলে ভারতশাসন পুঁথির মলাট-সদৃশ। এই মলাটের প্রসঙ্গে পঞ্চানন্দ যে করুণরসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব।

ইন্দ্রনাথের প্রতিভা সমাজতত্ত্ব-ব্যাখ্যানে ও হিন্দুত্ব-প্রতিষ্ঠা-চেষ্টায় সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ উপার্জ্জনশীল ধনী হইলেও, ইংরাজিনবীশ হইলেও, কালপ্রভাবকে পরাভব করিয়া খাঁটী ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন। এ পক্ষে তাঁহার পুরুষকার অপূর্ব্ব। তিনি বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখককে একবার লিখিয়াছিলেন—

"ধর্ম্মের আলোচনা আর ধর্ম্মের আচরণ—বলা সোজা, করা কঠিন। প্রায় অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তা' আচরণের ভাগ্যে যাহা হইবে হউক, কিছু কিছু আলোচনা করিতে পারো? অদৃষ্ট আর জন্মান্তর, মৃত্যুর পর মানুষের কি দশা হয়, স্বর্গ নরকের স্বরূপ বা বিশেষ পরিচয় কি?—এই কথাগুলির বিস্তারিত বিবরণ আমাদের শাস্ত্রে কি প্রকার আছে, তাহা, প্রমাণ সহিত, সংগ্রহ করিতে পারো? পণ্ডিত ব্যক্তির সাহায্য লইতেই হইবে। তাড়াতাড়ি কিছুই নাই; কিন্তু নিত্যকর্ম্মের মতন সংকল্প করিয়া অল্পে অল্পে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিবে কি?"

ইহার পর সমাজের ও অর্থতত্ত্বের কথা কহিতে যাইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের লিখিত "কি খাইব?" প্রবন্ধের অবলম্বনে যে কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"খবরের কাগজে কিংবা গোষ্ঠীর অধিষ্ঠানে যত কথার আলোচনা হইতে পারে, তাহার মধ্যে "কি খাইব" এই কথাই

গোড়ার কথা। অতএব, কথাটা যদি তুলিয়াছ, তবে ছাড়িও না; আগামীতে আবার লিখিও, তাহার পরে, তাহার পরে, তাহার পরে, যত দিন পর্য্যন্ত লোককে না মাতাইয়া তুলিতে পারিবে, তত দিন পর্য্যন্ত লিখিতে থাকো।

তবে, ক্রমশঃ আরও চাপিয়া লিখিতে হইবে। "কি খাইব" প্রশ্নে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অন্নপানের কথা উঠে। সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার—কর্ম্মমাত্রই উপস্থিত হয়। জীবিকাভেদের সুতরাং জাতিভেদের সমুদয় প্রসঙ্গই এ প্রশ্নের টানে আসিয়া পড়ে। অতএব ভুলিও না, কথাটা ছাড়িও না।

কেবল শাস্ত্র-শাসিত সমাজকে অবলম্বন করিয়াও যদি "কি খাইব" বিচার করো, তাহা হইলে কে প্রশ্নকর্ত্তা, ইহা মনে রাখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইও। ব্রাহ্মণে "কি খাইব" জিজ্ঞাসিলে যে উত্তর হইবে, শূদ্রে জিজ্ঞাসিলে সে উত্তর হইবে না, অন্য উত্তর হইবে। শাস্ত্রাধীন রাজা যখন নাই, তখন প্রশ্নের উত্তরদাতা কে হইবে, তাহাও দেখিও। কেন না, "কি খাইব" প্রশ্নের অভ্যন্তরে "কোথায় পাইব" প্রশ্নও নিহিত আছে।

"কি খাইব"—ইহা ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ হইলে, কিংবা হতাশের কাতর-ক্রন্দন হইলে বিচারের বিষয় হয় না। বাস্তবিক মা অন্নপূর্ণার সংসারে কোনও দিনই অন্নের অভাব হয় না, হয় নাই, এবং হইবে না। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যের উপদ্রবে সমাজে যে বিশৃঙ্খলা হয়, তাহা হইতেই এখানে ফেলা-ছড়া, আর ওখানে উপবাস হইয়া পড়ে। ইহা যদি পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারো, তাহা হইলে শাস্ত্রানুমোদিত অর্থনীতিতে সুবোধের শ্রদ্ধা হইবেই হইবে। শ্রদ্ধার পর

আচার, আর, শ্রেষ্ঠের আচার হইলে ইতরে অনুসরণ করিবেই করিবে।

আয়-ব্যয়, অর্থাৎ অর্থ উপার্জ্জনের উপায় আর অর্থ-বিনিয়োগের ব্যবস্থা—দুই-ই ভাবিতে হয়। ইহা ভাবিতে গেলেই (education) সুশিক্ষা কিসে হয়, সুশিক্ষার প্রণালী পদ্ধতি কিপ্রকার হওয়া উচিত, এ সব বিচার্য্য হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট যে এডুকেশনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, কিংবা ব্যবস্থার যে পরিবর্ত্তনাদি করিতেছেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের ইষ্টসিদ্ধিরই উপযোগী। তাহাতে আমাদের সম্যক ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টও হইতে পারে। এ অবস্থায় Education question-এ বিশেষরূপে আমাদের মনোনিবেশ করা আবশ্যক। সুশিক্ষা যাহাতে সুলভ হয়, স্বল্পব্যয়-সাধ্য হয়, সমাজের প্রকৃতির অনুরূপ হয়, এবং সমাজের বিহিত কর্ম্মের উপযোগী হয়, তাহার উপায় চিন্তা করা আবশ্যক। বাঙ্গালীর মধ্যে বড় জোর হাজার এম্, এ, বি, এল, কি দুই হাজার B. A.-র পরিশ্রম অল্পাধিক সার্থক হইতে পারে—দেশের ছেলে মারতে যায় কেন?

কি খাইব খুব বড় কথা তুলিয়াছ, খুব ভাল করিয়াছ। ছাড়িও না। দিন রাত্রি ভাবিও, তথ্য সংগ্রহ করিও—আর লিখিও। যদি দশ বিশ জনকে ভাবাইতে পারো, তোমার জন্ম সার্থক হইবে।”

কার্দ্দিন্যাল নিউম্যানের “সাহিত্যের মর্ম্ম” শীর্ষক এক উপদেশ (sermon) অবলম্বনে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক ‘হিতবাদী’তে দুই তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ সেই সকল প্রবন্ধ-সমালোচনার ব্যপদেশে শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দিয়া এত নূতন কথা বলিয়াছিলেন, এবং

বিষয়টি এতই বিশদ করিয়াছিলেন যে, উহা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করিবার বাসনা হইয়াছিল। কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে পত্রগুলি নষ্ট হইয়াছে, আর পাইবার কোনও উপায় নাই। ইন্দ্রনাথের বড়ই ক্ষোভ ছিল যে, আধুনিক লেখকগণের লিখিত রচনায় ধর্ম্মের ভাব নাই বলিলেও চলে। তিনি বলিতেন যে, ভাষার tone ও instinct অর্থাৎ ধাতু ও প্রকৃতি ঠিক বজায় না থাকিলে সে ভাষা টিকে না। আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যপদ্য অনুচিকীর্ষার বনিয়াদের উপর বিন্যস্ত, খোসখেয়ালের অত্যাচারে সদাপীড়িত, ইহার বাঁধন ছাঁদন নাই। ইন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে, লেখক পাকা হিন্দু হইতে পারিলে তবে তাহার লেখায় ও ভাষায় হিন্দুত্ব ফুটিয়া বাহির হইবে। যে ভাষায় ধর্ম্ম নাই, প্রয়োগ-সংযম নাই, তাহা এ দেশে বিকাইবে না—টিকিবে না। এই হেতু তিনি একবার "পঞ্চানন্দে" লিখিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষার কুস্তু রাশি, উহা রমণীকণ্ঠেই শোভা পায়।...তাঁহার মতন লেখক, ভাবুক ও রসিক বাঙ্গালা সাহিত্যে আর হয় নাই, বুঝি বা আর হইবে না।...ইন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য যে নিধি হারাইল, তাহা আর পাওয়া যাইবে না।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ইন্দ্রনাথের রচনাবলী হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল :—

কল্পতরু :—

সুখ যেমন চিরদিন থাকে না, দুঃখও সেইরূপ। যদি উপর্য্যুপরি ছয় মাস দিন হয়, তাহা হইলে, ছয় মাস কাল রাত্রিও হইবে। এখন যে স্থানে রৌদ্র, সময়ান্তরে সেখানে অবশ্যই ছায়া হইবে। অদ্য যে ঘরে আগুন লাগিল, একদিন না একদিন, অবশ্যই তাহার উপর বৃষ্টিপাত হইবে। ফলতঃ সকল অবস্থারই

পরিবর্ত্তন আছে। কল্য পরের লেখা পড়িতে পড়িতে আমার মুখের জল শুষ্ক হইয়া মুখে ধূলি উড়িতেছিল বলিলেই হয়, আজি আবার আমিই গ্রন্থকার—মহারাজ চক্রবর্ত্তী; "পাঠক!" "পাঠক!" করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কাণ ঝালা পালা করিতেছি, কাহারও কথাটী কহিবার যো নাই। অবস্থাপরিবর্ত্তনের এতদপেক্ষা সাধুতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

মধুসূদন আহার সমাপন করিয়া তিন ছিলিম তামাক মাটী করিলেন, তথাপি ভাবনার কূল পান না। এমতকালে, শ্রীযুক্ত গবেশচন্দ্র রায় আসিয়া উপস্থিত। হাবুডুবু খাইতে খাইতে পদ্মার জলে ভাসিয়া যাইবার সময় তুলার বস্তা পাইলে যেমন সুখ, অন্ধকার গলি-রাস্তার ভিতর, লণ্ঠন হস্তে পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গ পাইলে যেমন সুখ; নিদ্রিত গৃহস্থের দ্বার অনর্গল পাইলে, চোরের যেমন সুখ, মালিনীর সহিত আলাপ হইলে সুন্দরের যেমন সুখ, বাড়ীর সম্মুখে শুঁড়ির দোকান প্রতিষ্ঠিত হইলে মাতালের যেমন সুখ, এবং পরের ব্যয়ে পুস্তক প্রচারিত হইতে পারিবে, ইহা শুনিতে পাইলে গ্রন্থকারবিশেষের যেমন সুখ, গবেশ রায়কে পাইয়া মধুসূদনের তদপেক্ষাও অধিক সুখ হইল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, আবশ্যক হইলে গবেশ রায় যমপুরেরও বার্ত্তা আনিয়া দিতে পারেন।

বাস্তবিক গবেশ রায় যে একজন অসমসাহসিক লোক, ইহা তদীয় মূর্ত্তিদর্শনেই প্রতীয়মান হয়। মস্তকের কেশ হৃষ্টপুষ্ট, যেন যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত, কোন রকমে শূকর-কেশর-সম্মার্জ্জনার শাসনে অল্প প্রতিনিবৃত্ত। চক্ষু দুটী প্রকাণ্ড, যেন পান্শী নৌকার পিতলের চোক। কাণের পরিবর্ত্তে, যেন দুর্গাপ্রতিমার হস্তস্থিত

পিতলের ঢাল কাড়িয়া লইয়া দু আধখান করিয়া মস্তকের দুই ধারে বসাইয়া রাখিয়াছে। গালের মাংস সরিয়া গিয়া নাকে যোগ দিয়াছে, সুতরাং নাকটি যেন চিতল মাছের পিঠ। গোঁপের নীচে দাত, দাতের নীচে চিবুক। ঠোঁট ভিতরে ভিতরে আছে, কিন্তু দেখা যায় না। গণ্ডার-চর্ম্মী গবেশের দেহে অস্থি থাকাতে শরীর যেন ঢেউখেলান। বর্ণ পিতলের মত। গবেশ রায় না বেঁটে, না লম্বা।

কালাপেড়ে ধুতি-পরা নিমুর পিরাণে গলা অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত এবং হাতের অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত আবৃত; পান চিবাইতে চিবাইতে গবেশ রায় মধুসূদনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

... ...

সময় কাহারও হাত ধরা নয়, সময় রেলের গাড়ী অপেক্ষা দ্রুত চলে, সুতরাং সময় গাড়ীর অপেক্ষা করে না, গাড়ীই সময়ের অপেক্ষা করে। সময়ের শাসন-ক্রমে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। সেনানীর তূরিধ্বনি শুনিলে যেমন সৈন্যগণ যে যেমন অবস্থায় থাকুক, তৎক্ষণাৎ সসজ্জ হইয়া দাড়ায়, ঘণ্টার শব্দমাত্রে যাত্রিগণের মধ্যে সেইরূপ, গৃহপ্রবেশের জন্য একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। টিকিটের ঘরে টিকিট আদান প্রদানের জন্য একটী ছোট দ্বার কাটা থাকে; সেইটি যেমন উদ্ঘাটিত হইল, অমনি একটা মৃতদেহ পাইলে শকুনির পাল ও গঙ্গাতীরের শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় ইতর ভদ্র সকলেই সেই দ্বারের দিকে ঝুঁকিল,—অগ্রে টিকিট লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত; একটী ছেলে, লোকের চাপে কাঁদিয়া উঠিল; এক জন প্রাচীন, যাত্রীদের পায়ের নীচে পড়িয়া

গেল, অপর এক জন "ছোট লোক" তাহাকে টানিয়া লইয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইল।

•

গবেশ! তোমার পেটে এত সার! হে অস্মদ্! হে উত্তম পুরুষ! তুমি কেন এত লিখিয়া তোমার অঙ্গুলিকে কষ্ট দিতেছ? যে জন্য লিখিতেছ, তাহা কি খুজিলে পাইবে? যখন পাইবার হইবে, আপনিই পাইবে। তবে কেন? আবার কেবল তোমার কষ্ট নয়। "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" নির্জীব পক্ষীর পালক কে কাটিয়াছে, চিরিয়াছে, তাহাতে ঘর্ষণ করিতেছ। তোমাকে উপদেশ দিতেছি, লেখা ছাড়িয়া দাও। আমার কথায় না ছাড়, শেষে সমালোচক মহাশয়ের তাড়ায় ছাড়িবে, তাহা কি তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে? অহং ত তখন ঘাড় তুলিতে পারিবে না। নিজের কিছু অর্থ এবং সুখ্যাতির লোভে এবং দেশের উপকারে যদি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাক তাহা হইলেও বলি ঢের হয়েছে, এখন ইস্তফা দাও। অনেক উপায় আছে, যাহাতে দেশের কল্যাণ হয়, আপনারও হিত হয়। ইহার মধ্যে একটী অবলম্বন কর, দোষ দিব না। ঐ দেখ পাঠক! বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী,—তাহারাও ত লেখা-পড়া রীতিমত করিয়াছে?— কেমন অজ্ঞানতিমিরাবৃত দেশে বোতল বোতল সভ্যতা ও জ্ঞানের আমদানি করিয়া মামাত-ভ্রাতাদের (অর্থাৎ সূর্য্যিমামার দেশের লোকের) নিকট দিনে দিনে পরিবর্দ্ধনশীল আদর লাভ করিতেছে, পয়সাও পাইতেছে। আরও উপায় আছে, বাবাচরণ থানাদার ঘুস্ লয় না, প্রাণান্তে কাহারও সম্মান করে না, ফল কথা, কাতে পাইলে

কাহাকেও ছাড়ে না। তাহার বিরুদ্ধে কেন বিনামী দরখাস্ত দাও না? সে বশীভূত হউক না হউক—আর হইবে না, এ কথাও নিশ্চিত—তোমার ত কাজ হইবে! দেখ দেখি, ভবানীরঞ্জন ঐ পথ অবলম্বন করিয়া কি না করিল? দশ জনে চিনিল, গৌরব বৃদ্ধি হইল, গরিবউল্লার সর্ব্বনাশ করা হইল, নিজের কিছু লাভও হইল। এক এক করিয়া কত বলিব? এমন দশ হাজার সদুপায় আছে। কোনটাই ভাল না লাগে তুমিই উৎসন্ন হইবে।

... ...

রাত্রি প্রভাত হইল। সংসারের চোখ ফুটিল। কতকগুলা কাক কা কা স্বরে পরামর্শ করিয়া সরল এবং নির্ব্বোধ বালক-বালিকার উদ্দেশে একটা গাছ হইতে উড়িয়া গেল। ইহারা বিলক্ষণরূপে জানে যে, সকালেই ছেলের পাল ইহাদের জন্য উপঢৌকন সামগ্রী লইয়া বাড়ীর উঠানে এবং পথে পথে নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়। কাকের দল উড়িয়া গেল দেখিয়া আনন্দে একটা কোকিল কোন অদৃশ্য স্থান হইতে কুহু কুহু করিয়া উঠিল; বুঝি সে 'কাকের বাসা কখন খালি হইবে' সমস্ত রাত্রি তাহাই ভাবিতেছিল। আর কতকগুলা পাখী কোকিলের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ক্যাচ ম্যাচ করিয়া এক মহা কলরব তুলিল; ইহারা হয় বড় ধার্ম্মিক; নয় নিতান্ত দ্বেষপরবশ,—সংসারে ইহাদের মত লোক অনেক। একটী স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণীর তীরে এই ব্যাপার হইতেছিল। সেই পুকুরের জলে নক্ষত্রকুল সমস্ত রাত্রি নিজ নিজ মুখ দেখিতেছিল। পক্ষীদের কলরবে একটা বড় মাছের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মাছটা অমনি জল হইতে শূন্যে

লাফাইয়া উঠিল; কি দেখিল, কি বুঝিল, বলা যায় না, কিন্তু তখনই আবার জলের ভিতর ডুব দিল, আর তখন উঠিল না। একটা মাছ লাফাইল, কিন্তু সমস্ত পুকুরের জল তোলপাড় করিতে লাগিল, একজন মাত্র ইংরাজের মুখের কথায় সমুদায় বঙ্গদেশ টলিয়া উঠে;—এ সব পরাক্রমের কাজ। জল চঞ্চল হইল, আর মুখ ভাল দেখা যায় না, এজন্য নক্ষত্রগণ কোথায় সরিয়া পড়িল।

ভারত-উদ্ধার ঃ—

গাও মাতঃ স্বররমে, বাণী-বিধায়িনি,
কমল-আসনে বসি, বাণা করি' করে,
কেমনে ইংরেজ-অরি উদ্দান্ত বাঙ্গালী—
ত্যজিয়া বিলাস-ভোগ, চাকুরীর মায়া,
টানা-পাখা, বাঁধা হুঁকা, তাকিয়ার ঠেস
উৎসৃজি সে মহাব্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল-কোঁচা,—
ভারতের নির্ব্বাপিত গৌরব-প্রদীপ,—
তৈলহীন, সলতে-হীন, আভাহীন এবে—
জ্বালাইলা পুনর্ব্বার, উজ্জ্বলিয়া মহী।
বোনেদি ভারত-কবি মুনি বাল্মীকির
প্রেতাত্মার প্রেত-পদে করি নমস্কার,
অথবা প্রাচীন গ্রীশে, নগরে নগরে
ঘুরি, যত গোর-স্থান নিষ্কাশিত করি,

হোমর-কঙ্কালে আমি সেলাম ঠুকিয়া,
গীতাইয়া লইতাম ভারত-উদ্ধার-
বার্ত্তা; কিন্তু নব্যকবিদল-উৎপীড়নে
আছে কি না আছে তা'রা, এ সন্দেহ ঘোর
হইয়াছে মম চিতে, (এত অত্যাচারে
জীয়ন্ত মরিয়া যায়, তা'রা ত মা মরা !)
অভিমান আছে তাহে বাঙ্গালী বলিয়া,
পরপদ-ধ্যান মাতঃ বদ্ধাস্থিতে নারি,
তাই মা তোমারে সাধি। প্রকাশিয়া দয়া,
মত্তি ধরি, অবতরি স্বাধীন ভারতে,
বাখানি বাঙ্গালী-বীরে, বীরত্ব বাখানি,
বিস্তারে কৌশল-কাণ্ড বিবরিয়া তার
সফল কর মা জন্ম, তোমার, আমার।
  কালেজের পড়া শুনা সব করি শেষ,
ছু মাস ছ মাস ধরি আফিশে আফিশে
নিতি নিতি যাই আসি; কিছুই না হয়।
শুক্ল-চন্দ্র-কলা যেন বাড়ে দিনে দিনে,
ব্রাহ্মণীর হৃদাকাশে বিরাগ তেমতি
বাড়িতেছে মাত্র। পরিশেষে একদিন,
ধূলি-ধূসরিত জুতা, মলিন বদন,
ফেকো উড়িতেছে মুখে সাধি' জনে জনে,
ব্রাহ্মণীর ক্লান্ত কান্ত ঘরে ফিরে এনু,
খাবার কি আছে কিছু? জিজ্ঞাসা করিনু।
"ভস্ম খাও, দগ্ধানন! তোমার কপালে

পড়িয়া সকল সাধ পূরিয়াছে মোর ;
আছে মাত্র ছেলে দুটো—সংসার-বন্ধন—
নাহিলে, কলস রজ্জু ক্লেশ অবসান
করি' দিত কোন্ কালে। হে অক্ষম নাথ,
দুধের অভাবে বুঝি সে দুটোও মরে।"
না কহিলে নয় কথা, আপন আশয়,
পরাক্রম, আশা কত, সব বিস্তারিয়া
কহিনু ধনীরে। বুঝি, অসহ্য হইল,
ধরিয়া বিরাট ঝাঁটা প্রহার করিল।
তখন তিলার্দ্ধ তথা তিষ্টিতে না পারি'
পলাইনু নিজ ঘরে ; অর্গলিয়া দ্বার,
সুরেশ্বরী ছিল ঘরে, ভকতি করিয়া
সেবিলাম যথোচিত। দেবীর কৃপায়
দিব্য চক্ষু লভিলাম, হৈল দিব্য জ্ঞান।
দেখিলাম ভারতের ভাবব্য যত,
বর্ত্তমান হেন,—কিসে ভারত উদ্ধার
কবে হৈল কোন মতে কাহার দ্বারায়।
স্মরি স্বরীশ্বরী সরস্বতী সবিনয়ে,
গাইতে কহিনু তারে উপর্য্যুক্ত মতে।
আকাশসম্ভবা বাণী হইল তখন।—
"কেন বৎস, গুণনিধি, কৃতীকুলমণি,
গীত গাইবারে মোরে কর অনুরোধ ?
হইল বয়স কত, বার্দ্ধক্যে জরায়
অষ্ট অঙ্গ দড়ি দড়ি, দেহে নাহি বল,

বীণা ধরিবারে কষ্ট, খসি খসি পড়ে,
অঙ্গুলী কম্পিত হয় ; কণ্ঠ ছাড়ি যদি
শব্দ বাহিরেতে যত্ন করে কোন দিন,
স্খলিত-দশন তুণ্ডে হদদদ হয়।
আর কি সে দিন আছে ? এখন তুমিই
বরপুত্র আছ মম, জীও চিরদিন ;
যে গীত গাইতে ইচ্ছা গাও রে অবাধে।
ভাষা, ভাব, যাত, মিল, রস, তান, লয়
ফুৎকারে তোমার, সব হয় জড় সড ;
যাহা লিখ তাই কাব্য, যা গাও, সঙ্গীত ,—
আমা হ'তে পুত্র, বড হইয়াছ তুমি।
দেবের মরণ নাই তাই বেঁচে আছি,
নহিলে শঙ্কিতে সদা বাঁচিবারে সাধ
কার চিতে হয বল ? কবে ফুরাইবে,
দশদিক্ অন্ধকার করি চলি যাবে,
এই ভেবে দিন দিন হইতেছি ক্ষীণ।
তুমিই গাও রে গীত ওরে বাছাধন,
গাইতে পার ত ভাল, গাইবেও ভাল,
শুনিযা ত্রিলোকবাসী কাঁদিয়া মরিবে।"

... .

অন্তরে বাহিরে গ্রীষ্ম সহিতে না পারি,
হেন সন্ধ্যাকালে—শীতল হইব, বাঞ্ছা—
বিপিন একাকী ভ্রমে গোলদীঘি-তটে ;

—যথা সুরপতি, যবে দৈত্য-অনীকিনী-
বেষ্টিত অমরপুরী, এই যায় যায়,
ভ্রমে একা, চিন্তাযুক্ত, নন্দন কাননে।
ভাবিছে বিপিন ,—"হায়! গত কত দিন
এই ভাবে ; আর কত দিন বা সহিব
দারুণ যন্ত্রণা ; বঙ্গ, কত কাল র'বে,
বঙ্গবাসী পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে ?
আমি ত মরিব আগে, ক্রমে বংশলোপ ,
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যায়,
থাকিলেও বঙ্গ, তার নাম কে করিবে ?
ভারত কি চিরদিন পরাধীন র'বে !
সুখের চাকুরী ছিল, তুচ্ছ অপরাধে
দশের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল,
পাপিষ্ঠ ইংরেজ। পদে পদে প্রবঞ্চনা
যার, সেই কি না মিথ্যা-বলা দোষ ধরি,
ছুতোনাতা ছলে সর্ব্বনাশ সাধিল !
ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম।
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি।
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে
বিবিধ কল্পনা-খেলা করিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানামতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে

জাগাইতে গেনু—ওমা! সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে—ভারত! ভারত!
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভারতে ভারত-কথা বিকায় না আর।
গিয়াছে ধর্ম্মের দিন, এবে গলাবাজি,
তাও যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার।
—উপায় কিছুই নাই! কুপোষ্য সুপোষ্য,
পতিপ্রাণা প্রণয়িনী, দুগ্ধপোষ্য শিশু,
এ সব ফেলিয়া, দূর দেশান্তরে যাই,
তাও ত পারি না প্রাণ থাকিতে এ দেহে।
ইংরেজে আপত্তি নাই, যদি জনে জনে
"লাট"-পদে অভিষেকি আহার যোগায়।
ভারতের ভাগ্যদোষে তাহা ঘটিবে না,
আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহাবে না।
অসহ্য হ'তেছে ক্রমে, রাখিতে পারি না,
নিশ্চিত ইংরেজে দিতে হ'ল রসাতলে।
রুষ ভাল, যদি খেতে পাই দুই বেলা,
যবন মাথার মণি, জঠরের জ্বালা
নিবারণ করে যদি; না হয় স্বাধীন
হউক ভারতবর্ষ লুটে পুটে খাব।
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বঁটি করি করে
—হায় রে লজ্জার কথা, অন্য অস্ত্র নাই!—
—হায় রে দুঃখের কথা, অস্ত্র চালাইতে

শক্তি নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাসি-দেহে।—
"খঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"

... ...

বাঙ্গলায় বিভাবরী হইল প্রভাত।
আজি যেন নবোৎসাহে জাগিল বাঙ্গালা,
সমীর বহিল যেন স্বনবীন ভাবে,
ভাবি আনন্দের ভাবে হইয়া বিভোর,
প্রকৃতি পুলক-অশ্রু, শিশিরের ছলে,
সমধিক পরিমাণে ফেলিলেন যেন:
কামিনী, বিপিনকৃষ্ণ, বসন্ত, রমণী,
আর যত বঙ্গবীর, গ[illegible]জনীতে—
উৎসাহ আশঙ্কা, আশা নৈরাশ্য পর্য্যায়ে
পীড়িয়াছে তাহাদের হৃদয় যেমন,—
উঠিয়াছে চমকিয়া রহিয়া রহিয়া,
নাহি ভুঞ্জিয়াছে, তারা নিদ্রার বিলাস।
"সুস্বপ্ন, সুস্বপ্ন" বলি প্রণয়িনী-কুল
ধরিয়াছে তাহাদের বক্ষ চাপি চাপি।
দুরু দুরু করে হিয়া প্রভাত যখন,
বিপিন, বিশুষ্কমুখ, উঠিলা বাসরা
প্রণয়িনী-পদপ্রান্তে, ধরিয়া চরণ
"আজি রে সুন্দরি, দেখা জনমের মত
হয় বুঝি; আর বুঝি ও মুখ-কমল
হাসিবে না এ অভাগা মুখ পানে চাহি,
জনমের মত বুঝি হাসি ফুরাইবে;

একমাত্র আমি জানি তুষিতে তোমায়,
কে আর করিবে প্রীতি, সোহাগ, যতন,
আমি যদি যাই, প্রিয়ে, প্রাণের পুতলী ?"
কান্দিলা বিপিনকৃষ্ণ ঝর ঝর ঝরে।
"সে কি কথা প্রাণনাথ ? এ কি কুলক্ষণ ?"
উঠিয়া বসিল সতী, পতি-কর ধরি,
"কোথায় যাইবে তুমি ? কেন হেন ভাব ?
নিবার নয়ন-বারি, রোদন তোমার
কভু নাহি শোভা পায়, কি দুঃখে বা কান্দ ?
নাহিক চাকরী, তাই যাবে কি বিদেশে
করিতে অন্নের চেষ্টা, করিয়াছ মনে ?
কাজ কি তোমার গিয়া, এত ক্লেশ যদি
পাও তুমি মনে, নাথ ! কাটনা কাটিয়া
খাওয়াইব ঘরে বসি, ভাবনা কি তার ?
অবশ্যই কোন মতে দিন কেটে যাবে।"
"তা নয় প্রেয়সি" ব'লে ঈষৎ হাসিয়া
বিপিন, আরুদ্ধ-কণ্ঠ চিত্তের আবেগে,
—সে হাসি কান্নার সনে মিশিয়া সুন্দর,
রৌদ্র বৃষ্টি এক সঙ্গে হায় রে যেমতি
নববর্ষা-সমাগমে—"তা নয় প্রেয়সি,
স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে বাহিরিব আজি,
করিব বিচিত্র রণ ইংরেজের সনে,
শেষে পরাজিব তারে, সফল জনম
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা ধন,

বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা।"
"রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হইবে না,
কোথায় বাজিবে অঙ্গে"—চমকে বিপিন,
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ তা'র কাঁটা দিয়া উঠে—
"দেখ দেখি যার নাম করিতে স্মরণ
অস্থির হতেছ হেন, সহিবে কেমনে?
কে দিল কুবুদ্ধি ঘটে? তার মাথা খাই,
দেখা যদি পাই এবে। বলি প্রাণনাথ,
দেশ ত দেশেই আছে, কি আর উদ্ধার?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি,
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে,
আমারেই দাও নাথ, ল'ব শিরঃ পাতি,
আমি তব চিরদাসী।" "ভয় নাই সতি,
স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বাধীনতা মহাধন,
বুঝিবে না মর্ম্ম তুমি,—দর্শন বিজ্ঞান
পড়া শুনা না থাকিলে বুঝা নাহি যায়।
তোমারে দিবার বস্তু নহে তা কদাপি।
কৌশলের যুদ্ধে দেহে কভু না বাজিবে;
নিশ্চিত যাইব রণে, উদ্যম ভাঙ্গিয়া
হতাশ্বাস, হতবল করিও না মোরে।"
"ভয় যদি নাই তবে চক্ষে জল কেন?"
"প্রিয়া-মুখ না হেরিলে যাত্রা নাহি হয়,
যাত্রা-কালে নেত্র-জল বাঙ্গালী-কল্যাণ,
উদ্দেশ করিয়া যদি কোন(ও) কাজে যাই

গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কান্দিবারে হয়।"
"নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়বল্লভ,
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,"
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলু-ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।"—বিপিন সম্মত।
এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে।

পাঁচুঠাকুর :—

লেজ ! লেজ !! লেজ !!!

অতি উৎকৃষ্ট, সুগোল, সুদীর্ঘ, সুগঠন বিস্তর লেজ আমাদের দোকানে বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে। লেজগুলি আসল বিলাতী কারিকরের তৈয়ারি এবং জাহাজে করিয়া খাস চালানে আমদানি করা হইয়াছে। এই লেজগুলি এত উত্তম এবং উপাদেয় যে সঙ্গতি থাকিলে আমরা নিজেই ব্যবহার করিতাম। যাহাদের পয়সা নাই, যাহারা আমাদের মত নিরন্ন, তাহাদের কিনিবার চেষ্টা করা বৃথা। লেজগুলি সুলভ, কিন্তু কেবল রোজগেরের পক্ষে।

লেজগুলি বিশেষ উপকারজনক। তুমি যখন মাতাল হইয়া আড়ষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকো, চক্ষুতে পলক নাই, মুখে বচন নাই, হাত পায়ে স্পন্দন নাই, তখন এই লেজ আপনা আপনি তোমার বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে, মুখের কাছে ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া মাছি তাড়াইতে থাকিবে। টাকাওয়ালা বাবু হও, তো লেজ লও।

তুমি এক প্রকাণ্ড বক্তা, মস্ত বুদ্ধিমান্ উকীল, সওয়াল জবাব করিতেছ, হাত পা কতই নাড়িতেছ, এমন সময়ে মোক্তার আপন কাদ্দানি দেখাইবার জন্য তোমার কাণের কাছে ভিন ভিন করিয়া তোমার স্রোত ভঙ্গ করিয়া দিতেছে, তোমাকে বিরক্ত করিতেছে। থামাও তাহাকে, লেজের এক বাড়ি মারিয়া। লও লেজ, ভালো উকিলের বিশেষ দরকারি। অনেক কাজে লাগিবে।

তুমি হাকিম, এজলাসে বসিয়া উত্তর পূর্ব্ব জ্ঞান হারাইয়া কি মাথা মুণ্ড করিতেছ, তাহার ঠিকানা নাই। যেটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি গোড়ায় ছিল, তাহা মেজাজের গরমে গলিয়া গিয়াছে। শেষে আপীল আদালত উপরওয়ালার ভয়ে উড়িয়া গিয়াছে। আমি তোমার বন্ধু মানুষ, কাছে বসিয়া আছি, অথচ সময় মতে উপদেশ দিয়া তোমার উপকার করিতে পারিতেছি না, প্রকাশ্যভাবে তখন কিছু বলিয়া দিলে তোমার আত্মগরিমায় জখম লাগে, বাজে লোকের কাছে তুমি পদস্থ হও। একটী লেজ থাকিলে কোনও ভয় থাকিবে না সময়শিরে লেজ টিপিয়া দিয়া তোমার বন্ধু পশ্চাৎ হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন। যদি সুবোধ হও বুদ্ধির পরিচয় দিতে চাও, দশের কাছে আপন গুণপণার যথার্থ পরিচয় দিতে চাও, তাহা হইলে লেজ লও। লেজ থাকিলে আর ভুল হইবে না।

তুমি ময়লাফেলা কমিশনর, অমুক কমিটির মেম্বর, রায়ে রায় দিয়া সাহেবের মন যোগানো, আর পাড়াপড়সিকে ভোগানো তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। সাহেবের হাতে যদি তোমার লেজটি দিয়া রাখিতে পারো, তাহা হইলে তুমি নির্ভয়, নিঃসংশয়,

নিশ্চিন্ত। সাহেব যেই লেজ ধরিয়া টান দিবেন, অমনি তুমি সাহেবের দিকে ঝুঁকিবে। যদি এ সম্মানের পদ রাখিতে চাও, একটি লেজ লও। লেজ নহিলে তোমার কিছুতেই চলিবে না।

তুমি বড়লোক, চিহ্নিত ব্যক্তি, কত সভা-সমিতিতে কত দরবারে তোমার নিমন্ত্রণ হয়। লেজ থাকিলে অনেক জায়গায় অপ্রতিভ হইবে না, পাগড়ি সঙ্গে না থাকিলে তোমার ক্ষতি হইবে না, আর, বাজে লোকের গোলে কখনও মিশিয়া যাইবে না। লেজ না থাকায় অনেক অনেক জায়গায় অনেক সময়ে তোমার গোল হয়, লোকে তোমাকে চিনিতে পারে না, তোমার উচিত সম্মান করিতে পারে না, সেই জন্যই গোল হয়। লেজ লও, তাহা হইলেই যত গোল মিটিয়া যাইবে।

তুমি বাগ্মিপ্রধান সভাপতি মহাশয়, তোমার একটী লেজ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি বায়ুর বর পুত্র, তুমি কথায় কথায় ঝড় বাহির দাও বায়ুবেগে আপনি কতই উচ্চে আরোহণ করো। তোমার সঙ্গে উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে ভারত এত দিন অধঃপতিত থাকিত না। কিন্তু নিঃসহায়, নিরবলম্ব ভারত কি ধরিয়া উঠিবে? তুমি লেজে বাঁধিয়া না তুলিলে এই অসাড় জড়ভরত ভারতের কোনই উপায় নাই। লেজ লও, তোমার মহিমার ধ্বজা উড়াও, ভারতের উদ্ধারবার্ত্তা বায়ুবেগে বিঘোষিত করো। মহাভাগ, লেজ লও।

আর তুমি যক্ষরাজ, কুবেরের কুঠিয়াল, লক্ষ্মীর বিশ্বাসপাত্র, তোমাকে একটী লেজ লইতেই হইবে। তোমার অভাব নাই তাহা জানি, তথাপি তোমার যত লেজ বাড়িবে, ততই সম্মান বাড়িবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। দেখো তোমার কত দিকে

কত টান, কিন্তু সাহেব সুবার টানেই তোমার লেজমালা দিবানিশি যোড়া থাকে। আমাদের মত গরিব লোকের জন্য একটা পৃথক্ লেজ যদি রাখিয়া দাও, তাহা হইলে অনায়াসেই তোমার বার পাইতে পারি। তাই বলিতেছি, গুণরাম একটা লেজ লও। তোমার ক্ষতি নাই, আমাদের ষোলো আনা লাভ, ভারতবর্ষের চারি পোয়া উপকার, একটা লেজ লও!

নগদ মূল্যে লইলে এক একটা রম্ভা দস্তুরি দেওয়া যাইবে।

পেসাদার এণ্ড কোম্পানি।

[বাণিজ্যের উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয়, এই জন্য আমরা বিনা মূল্যে এই বিজ্ঞাপন পত্রস্থ করিলাম। ভরসা করি গ্রাহকবর্গ লেজের গৌরব অনুভব করিয়া আমাদের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।]

বিজ্ঞাপন।

১ নং।

মহৌষধ! অব্যর্থ মহৌষধ!!

পঞ্চানন্দের এণ্টি-বোকামি মিকশ্চার।

অর্থাৎ

বোকামি-নাশক আবক।

এই ঔষধ সেবন করিলে, নিরেট বোকামি, পুরুষানুক্রমিক বোকামি, আকস্মিক বোকামি, দৈবাৎ বোকামি, দায়ে পড়িয়া বোকামি প্রভৃতি যত প্রকার বোকামি আছে বা হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় সারিয়া যায়। না সারিলে, কবুল জবাবের পত্র পাইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরত দেওয়া যায়।

সঙ্গতি বুঝিয়া বারো অথবা চব্বিশ মাত্রা সেবন করিলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য। নিয়ম না থাকাই এবং না রাখাই ইহার নিয়ম।

যাহারা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ চাহেন, ভারত-মাতাকে গাউন্ বনেট্ পরাইয়া নাচাইতে চাহেন, বাঙ্গালার বদলে ইংরেজী চালাইতে চাহেন, গলার জোরে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

যাঁহারা বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধাদি কিনিয়া থাকেন, গেজেটের অনুরোধে দান ধ্যান করিয়া থাকেন, সভ্যতার খাতিরে মদ্যপান করিয়া থাকেন, নামকা-ওয়াস্তে ময়লা-ফেলা কমিশনার হইয়া থাকেন, পিতৃশ্রাদ্ধের ভয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া থাকেন, তাহাদের এই মহৌষধ ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

আর, যাহারা কাগজের গ্রাহক হইয়া দাম দেন না, না বুঝিতে পারিলেও সমালোচন করিতে কাতর হন না, লিগুলী মরের সপিণ্ডীকরণ করিতেছেন, সেই জন্য মাতৃভাষার ধার ধারেন না, তাহাদের অন্য উপায় নাই, এই মহৌষধ লইতেই হইবে।

সদর মফস্বলে প্রভেদ নাই,
ডাকমাশুলের চাপ নাই,
ছোট বড় বোতল নাই,
সমস্তই একাকার, সমস্তই সমান।
মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

লেখায় ব্যাঘাত।

লিখিব কি, লেখায় গোল পড়িয়াছে। আমি বাঙ্গালার বানান ঠিক করিতে পারি না। আজ হঠাৎ এই দুর্ভাবনা

উপস্থিত হইয়াছে এমন নয়, অনেক দিন অবধি আমি এই ভাবনায় ভাবিত। যত দিন যাইতেছে, ভাবনাও ততই বাড়িতেছে। হয়ত, অনেকে মনে করিবেন যে, আমার এই এক রঙ্গ। কিন্তু রঙ্গ নয়, প্রকৃত কথাই বলিতেছি!

বাঙ্গলাভাষার বর্ণমালা নাই, সেই জন্যই বানানের বিড়ম্বনা। এই যে অ, আ, ই; ক, খ, গ, লইয়া এত কাল আমাদের কাজ চলিয়া আসিতেছে, ইহা কতকটা গরজে এবং গায়ের জোরে। বস্তুতঃ অ, আ, ই; ক, খ, গ, বাঙ্গলার বর্ণমালা নহে, সংস্কৃতেরই বর্ণমালা। পরের পোষাক গায়ে ঠিক না হইবারই কথা।

যে পরে, কোন রকমে তাহার কাজ সারা হয় বটে কিন্তু তাহার মন খুঁৎখুঁৎ করিবেই করিবে, পোষাকেরও যদি একটা মন থাকিত, তাহা হইলে পোষাকও বোধ হয় খুঁৎখুঁৎ করিত।

বাঙ্গলার বর্ণমালা নাই। ইহা নূতন কথা কি না জানি না, কিন্তু ইহা যে প্রকৃত কথা, তাহা একটু বুঝাইয়া বলিব। একটী একটী বর্ণ, একটি একটী পৃথক ধ্বনির দ্যোতক চিহ্নমাত্র। কোন একটী ভাষায় যতগুলি পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি উচ্চারিত এবং ব্যবহৃত হয়, ততগুলি পৃথক্ পৃথক্ চিহ্নের প্রয়োগ থাকিলে তবে সে ভাষার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বর্ণমালা আছে বলা যায়। মিশ্রভাষায় এই ধ্বনির সংখ্যা নিতান্ত অনিশ্চিত। কখন বাড়ে, কখন কমে, কিছুই বলা যায় না। এই জন্য মিশ্রভাষাতেই বর্ণবিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা মিশ্রভাষা।

বাঙ্গালায় কতক সংস্কৃত, কতক হিন্দী, কতক উর্দ্দু, কিছু ফারসী, আজিকাল আবার কিছু কিছু ইংরেজীও জুটিয়াছে এবং জুটিতেছে। এই জন্যই বাঙ্গলাকে মিশ্রভাষা বলি। যতগুলি

ভাষার শব্দ, এই বাঙ্গলা-ভাষায় আসিয়া স্থান লাভ করিতেছে, ততগুলি ভিন্ন জাতীয় ধ্বনিও বাঙ্গলায় প্রয়োগ করা আবশ্যক হইতেছে। অথচ, দেশের প্রকৃতিবশতঃ সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধ্বনি অবিকলরূপে তিষ্ঠিতে পারে না, ধ্বনির অল্পবিস্তর বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। তাহার ফল এই হয় যে, কোন এক ভাষার বর্ণমালাই যথাযথরূপে এই মিশ্রভাষার প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না, এবং সকল ভাষার বর্ণমালা একত্র করিলেও সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না।

মিশ্রভাষার প্রকৃতিবশতঃ স্বতই পূর্ব্বোক্ত দোষ বা বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে। তাহার উপর, আর একটা উপসর্গজনিত দোষ আছে। সে দোষ এই যে, কথোপকথনের ভাষা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অন্যান্য বিষয়ে যেমন হউক, উচ্চারণ বিষয়ে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহারই কথা এখানে বলিতেছি। বাণিজ্যের বিস্তার, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গতাগতির বৃদ্ধি, এবং তন্নিমিত্তক আলাপের বাহুল্যবশতঃ যে পরিবর্ত্তন ঘটে। বাঙ্গলা সম্বন্ধে তাহা এখন অধিক মাত্রাতে ঘটিতেছে। একটু ভাঙ্গিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া কথা কয়টা বুঝান যাউক।

সংস্কৃত বর্ণমালাই বাঙ্গলার বর্ণমালা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। জ, য, আকৃতিতে ভিন্ন হইলেও, ধ্বনির দ্যোতকতা বিষয়ে একেবারে অভেদ। এইরূপ ণ, ন, কিম্বা শ, য, স, নামে ও মূর্ত্তিতে পৃথক হইলেও, কাজে কিছুমাত্র পৃথক নয়। বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব কেবল বর্ণগণনায় পাওয়া যায় মাত্র, নহিলে নাম রূপ কিম্বা প্রয়োগ কোন বিষয়েই ইহাদের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

স্বরবর্ণের আরও গোলযোগ। বাঙ্গলা ভাষায় হ্রস্ব-দীর্ঘের

প্রভেদ নাই। অথচ সংস্কৃত ভাষায় এই হ্রস্ব-দীর্ঘই বিশেষ লক্ষ্যের সামগ্রী। সেই সংস্কৃতের "হ্রস্ব-দীর্ঘ" বাঙ্গালায় আসিয়া, আপনিও বিব্রত, আমাদিগকেও বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে। যেমন "ঘোষেদের হরি" আর "দাসেদের হরি" বলিয়া এক নামের দুই প্রতিবেশীকে চিনিতে এবং চিনাইতে হয়, বাঙ্গালায় এই হ্রস্ব-দীর্ঘ লইয়াও ঠিক সেই রকম করিতে হয়। ছেলেদের পাপের ভোগ, হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ই, হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-উ, মুখস্থ না করিয়া তাহারা বর্ণমালা হইতে কোন ক্রমেই নিস্তার পায় না। ই, ঈ, উ, ঊ, যদি বস্তুত বাঙ্গলায় পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনির দ্যোতক হইত, তাহা হইলে শিশুদিগকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে কেন? বাঙ্গলা বলিয়া সংস্কৃতের বর্ণমালা আরম্ভ করিতে হয় বলিয়াই তাহাদের এ কর্ম্মভোগ। শুধু ছেলেদেরই বা কেন? অক্ষয় দাদার তাড়নায়, আর তাঁহার ছাপাখানার অনুরোধে আমাদের অনেক 'ঈ'কে হ্রস্ব হইতে হইয়াছে। অক্ষরের মাথা ভাঙ্গিবে বলিয়া দাদা ভয় দেখাইতেন, কাজে কাজেই ভয়ে ভয়ে আমরাই মাথা খাটো করিয়া লইতাম।

আবার ঋ, ৯, স্বরবর্ণ বলিয়া বাঙ্গলাতে পরিচিত। ৯র সঙ্গে খাঁটি বাঙ্গলাভাষীর জন্মের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় কি না সন্দেহ। অথচ ৯ একজন স্বরবর্ণ! যদি ঋ আছে তবে "রি" কেন? আর 'রি'তে যদি চলে, তবে ঋ কেন? খাঁটী বাঙ্গলা-ভাষী কখনই ইহার কৈফিয়ৎ দিতে পারিবেন না।

আরও আছে। "শ্রুতিলিখনে" পণ্ডিত মহাশয় সুধু নম্বর কাটিয়া ছাড়িতেন না, কাণ মলিয়াও দিতেন! কিন্তু "বধূ ঠাকুরাণী" বাঙ্গালায় 'বৌ' না কি "বউ" না কি 'বঊ' তাহা

আমরাও জানি না, পণ্ডিত মহাশয়ও জানেন না। কেমন করিয়া 'ঐ' লিখিব? 'ঐ' লিখি কি 'অই' লিখি, কি 'ওই' লিখি, তাই স্থির করিতে পাঁচ মিনিট আমার এই প্রবন্ধ কামাই গেল।

তবু এখনও ফলার কথা বলি নাই। য-ফলা আর ব-ফলা দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয়ে আমাদিগকে কেমন যন্ত্রণা দিয়াছেন, এখনকার নাটক লেখকদিগের হাতে পড়িয়া যেমনি জব্দ হইতেছেন। দৃষ্টান্ত কত দিব?—কোন একখানা নাটক কি হরিদাসের গুপ্তকথা দৃষ্টিমাত্রেই দৃষ্টান্ত। তবে "মৃত্যুতে" আবার একটী—য-ফলা কেন, এক বানানে 'সদ্যঃ' আর 'চোদ্দ' কেন চলে না, কেহ কি তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন? আমাদের "দ্বারা"র ব বাজে খরচ। "আত্মা"য় ম থাকিয়া না-থাকা; তবে চন্দ্রবিন্দু দিয়া যে 'তঁ' হয়, "ম" নিজ স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া ঐ রকমে ব্যাগার দেন। আর এক রকম দেখ। অকারান্ত কি হসন্ত, বর্ণের মূর্ত্তি দেখিয়া কিছুই চিনিবার যো নাই। সংস্কৃতে হস্ চিহ্ন না থাকিলেই অকার দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। বাঙ্গালায় কোন ব্যবস্থাই নাই। এই ছত্র কতক আগে "খাটো" লিখিতে গিয়া ওকার দিব কি দিব না, ভাবিতে ভাবিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছিলাম। অথচ দরকার মত ওকার দিতে গেলে এক ওকারের খরচেই জেরবার হইয়া পড়িতে হয়। এমন কত আছে।

যেগুলি দেখাইলাম, সেগুলি বানানের সংশয়স্থল। এমন করি কি অমন করি, ইহাই সেখানে ভাবিতে হয়। কিন্তু ইহা ছাড়া মূলে অভাব হয়; পুঁজিতে এক বারে কুলায় না, এরূপ

ক্ষেত্রেও বহুতর আছে। "এক" লিখিয়া 'এ'র যেরূপ উচ্চারণ করি, "এবং" লিখিয়া 'এ'র তেমন উচ্চারণ করি না। অথচ ঐ একের 'এ' আমাদের দুবেলা দরকার। কেহ একারেই কাজ সারেন, অনেকে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিচিকিৎস্য এক য-ফলা আকারের (্যা) সৃষ্টি করিয়াছেন। সংস্কৃত মানিতে হইলে যাহা চাই, ইহাতে তাহা হয় না। ইহাতে "ই আ" হয় "চালে আগুন লাগিয়াছে" দেখিলে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়। গৃহদাহ উপস্থিত, না কি তণ্ডুল মহার্ঘ, কোন মতেই ঠিক করা যায় না। তণ্ডুলের চালে যে আধখানা 'ই' আছে, বর্ণমালায় সেটুকুকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "বোসেদের বাড়ী" বলিতে যে একটু মজা আছে, বানানে সেটুকু কিছুতেই আদায় হয় না।

এদিকে অভাবে মারা যাইতে হয়। অথচ আস্তাবলে বসিয়া বসিয়া দুই একটি বং দানা খাইতেছে, তাহাকে অন্য কাজে লাগাইবার নহে কাহারও দোষ না। একটা 'য়া' লিখিতে—যেমন "ওয়াচঘড়ি কিংবা 'দম ওয়াশীল' ইত্যাদি ঐ এক 'ওয়া' লিখিতে দুটা স্বর। আর একটা সন্ধ্যাক্ষর ব্যঞ্জন বর্ণের খোসামোদ করিতে হয়। অথচ, সকলে মিলিয়া অন্তস্থ ব টাকে লাগাইয়া দিলেই সচ্ছন্দে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু কেমন আমাদের অদৃষ্টের দোষ, বোধ হয় কোথাও কাজে লাগিয়াও বিগড়িয়া বসিয়াছে। 'খাবা হইল, তবু 'খাওয়া" গেল না। 'ব' আসিল, তবু "ওয়া' গেল না।

বিস্তারে কেবল পুঁথি বাড়িবে। ফলে যাহা দেখাইলাম, তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, সংস্কৃত বর্ণমালায় বাঙ্গলার কাজ ঠিক চলে না। বাঙ্গলার যে অংশ সংস্কৃত-মাতৃক, তাহাতেই এই,

যে অংশ অন্যান্য ভাষা হইতে আমদানি হইয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। উর্দ্দু এবং ইংরেজীর অনেক ধ্বনি একবারে অপ্রকাশ্য।

এই সকল হেতু উপলক্ষ করিয়াই বলিয়াছি যে, বাঙ্গলা ভাষার বর্ণমালা নাই। নাম মাত্র সংস্কৃত বর্ণমালা বাঙ্গলায় স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ হয় নাই। তাহার উপর মিশ্র ভাষা বলিয়া বাঙ্গলায় আরও বিপত্তি উপস্থিত। বিষয় কর্ম্ম ঘটিত অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক নহে। এই কাগজ, কলম, দোয়াৎ, জমী, জেবাং, মাল, লাখরাজ, কাছারী, খাজনা, দেওয়ান অবধি চৌকীদার পর্য্যন্ত সমস্ত আম্‌লা, যত দলিল দস্তাবেজ ঘরের অনেক আশবাব প্রভৃতি কিছুই সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক নহে। এখন আবার ইংরেজীও এই রকমে বহুতর প্রবেশ করিতেছে।

সুতরাং বানানে বিষম গোল। বানান ঠিক না করিয়া লিখিব কেমন করিয়া?

ক্ষুদিরাম ঃ—

সংসার নিস্তব্ধ। মধ্যাহ্ন-আকাশে মরীচিমালী মার্ত্তণ্ডদেব মনের সুখে মজা করিতেছেন, তবু সংসার নিস্তব্ধ। রৌদ্রে জগৎ ভাসিতেছে, ত্রিলোক হাসিতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। পথিক চলিতেছে, শিশু খেলিতেছে, গাড়ি ছুটিতেছে, কেরাণী খাটিতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। কোথাও প্রণয়ের ফুল ফুটিতেছে, কোথাও বিরহী মাথা কুটিতেছে, কোথাও আনন্দের উচ্ছ্বাস, কোথাও ক্ষোভের তপ্তশ্বাস, কেহ কাজ লইয়া ব্যস্ত, কেহ কাজের অভাবে ত্রস্ত; কেহ বা পাইতেছে, কাহার বা যাইতেছে, বেচা-কেনা, লেনা-দেনা সবই হইতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। এই ইহারই মধ্যে সেই যুবা পুরুষ, সেই দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অধৈর্য্য হইতে হইতে, কত ফেরিওয়ালা কত রকম

ডাক ডাকিয়া, কত দিক্ হইতে কত দিকে চলিয়া গেল। তবু সংসার নিস্তব্ধ। "পয়সে কা পচীস্ সূই"—"সিল্‌বে-জুতিয়ে"—"ইব্-কম্-উ ও"—"মুংক-ডাল"—স্ফুট, অস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট, সুবোধ, অবোধ, দুর্ব্বোধ, নির্ব্বোধ, কত ডাকাডাকি কত হাঁকাহাঁকি হইয়া যাইতেছে, তথাপি সংসার নিস্তব্ধ।

ইহাই সংসার। এইরূপই সংসারের নিয়ম। উপন্যাস-লেখকের শব্দবিন্যাস নহে, কবি-কল্পনার অলীক জল্পনা নহে, প্রকৃত সংসার ত এই। যখন একটি পয়সা, কিম্বা এক লক্ষ টাকার চিন্তায় তুমি উন্মত্ত, যখন তোমার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই; যখন না জানিয়া, না শুনিয়া, কিম্বা না মানিয়া তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম নিঃসঙ্কোচে পদদলিত করিয়া যাও, যখন তুমি মনে কর যে, এ সংসারে তোমার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই,—তখন বন্ধু বান্ধব জিজ্ঞাসা করিলে, কিম্বা অন্তরাত্মায় উদিত হইলে "কি করি, সংসার চলে না" বলিয়া তুমি যে উত্তর দাও, সে কোন্ সংসারকে উদ্দেশ করিয়া? ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে, গুরুজনের অবজ্ঞা না করিলে, বিলাসে বাধা পড়িলে, কিম্বা অভীষ্টে বিঘ্ন ঘটিলে, সত্যই কি সংসার অচল হয়? সংসার কি তোমারই হাত পা লইয়া চলে? তুমি যখন কর্ম্মক্ষম হও নাই, তখন কি সংসার চলিত না? তুমি ছাড়িয়া গেলে সংসার যদি নিতান্তই ক্রন্দন করে, তাহা হইলে কি অচল হইয়া, স্থাণুর ন্যায় দাড়াইয়া কাঁদিবে? তাহা নহে। সংসার পূর্ব্বেও চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে, পরেও চলিবে। যাহার সংসার, তিনিই চালাইতেছেন, পরেও তিনিই চালাইবেন। তুমি চলিয়া যাইবে, তখনও সংসার চলিবে। গ্রহ, নক্ষত্র, দেবতা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, দিক্, দেশ, কাল,—কিছুই অচল থাকিবে না, সংসার চলিবে। সংসার তোমাকে একেবারে ভুলিয়া যাইবে, তখনও সংসার চলিবে। তবে কেন বল যে "সংসার চলিবে না?"